যুগান্তর

তারিখ 17 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ড. শওকত আরা হোসেন

বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন

সত্তর দশকে উন্নয়নে নারী (Women in development) নীতিমালার উদ্ভব হয়। গবেষকগণ বিভিন্ন তথ্যসহ প্রমাণ করেন যে, ষাট এবং সত্তর দশকে উন্নয়নের সুফল পুরুষের তুলনায় নারীরা ভোগ করেছেন অনেক কম। অনেক ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। 'উন্নয়নে নারী'– এ নীতিতে বলা হয়, নারীরা তাদের দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত নয়, কাজেই তাদের অবস্থা দিনকে দিন অধস্তন হচ্ছে। নারীরা যদি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অংশীদার হয় তবে নারী-পুরুষের এই অসম অবস্থান আর থাকবে না। উন্নয়নে নারী নীতিমালার বিভিন্ন দেশে যে কৌশলগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো হল– (১) কল্যাণধর্মী কৌশল, (২) সাম্যধর্মী কৌশল, (৩) দারিদ্র্য বিমোচনমুখী কৌশল, (৪) দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কৌশল, (৫) ক্ষমতায়ন কৌশল। কিন্তু সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আধুনিকায়নতত্ত্ব ও উন্নয়নে নারী নীতিমালার কিছু ব্যর্থতার দিক দেখা যায়। ফলে নারী এবং উন্নয়ন নীতিমালার উদ্ভব ঘটে।

উন্নয়নে নারী নীতিমালার সবচেয়ে সীমাবদ্ধতা ছিল– নারীরা যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত তা তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া এ নীতিমালার আরও কিছু ব্যর্থতা আছে। তারপরও বলা যায়, উন্নয়নে নারী নীতিমালাই সর্বপ্রথম নারীকে উন্নয়নের পথে নিয়ে আসে। নারী এবং উন্নয়ন নীতিমালার উদ্ভব ঘটে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। এই নীতি মনে করে যে, সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই নারীরা উৎপাদনপ্রক্রিয়ার অংশ। তাই নতুন করে নারীকে উন্নয়নে সংযুক্ত করার অর্থই হল নারীকে অধস্তন মনে করা। এ নীতিমালা তাই উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও নারীর মধ্যকার সম্পর্কের ওপর বেশি জোর দেয়। নারীর উন্নতির জন্য এ নীতিমালা রাষ্ট্রের পরিকল্পিত কৌশলের কথা বলে। সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে কৌশলমূলক কর্মকাণ্ড নারীর অবস্থা উন্নত করবে। আসলে এ নীতিমালা একটি নব্য-মার্ক্সবাদী ধারণা, যা নির্ভরশীলতা তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে রচিত। শ্রেণী-সচেতনতা এই নীতিমালার অন্যতম ভিত্তি হওয়ায় পিতৃতান্ত্রিকতা এবং নারীর অধস্তনতার কারণটি বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। উন্নয়নে নারী ও নারী এবং উন্নয়ন– এ দুটো নীতিমালার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য আশির দশকে জেন্ডার এবং উন্নয়ন নীতিমালার উদ্ভব ঘটেছে। এ নীতিমালাও কিছু সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

নারী এবং পুরুষের মধ্যে প্রাকৃতিক ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু জেন্ডার বৈষম্য হচ্ছে সমাজে আরোপিত কিছু নিয়ম-কানুন। এ নীতিমালা নারীর বাস্তব ও কৌশলগত চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে কাজ করে। অন্যদিকে নারী সমস্যার মূল কারণগুলোকে সামাজিকভাবে বিলুপ্ত করতে চায় । এ নীতিমালার অনুসারীগণ প্রয়োজনে নারীর অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ওপর জোর দেয়। এই নীতিমালা নারীর শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নেই সচেষ্ট নয়, নারীর রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্যও তারা সচেষ্ট। এ নীতিমালার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নারীর তিন ধরনের ভূমিকাকেই : (ক) উৎপাদনমূলক, (খ) পুনঃউৎপাদনমূলক এবং কমিউনিটির কাজ সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং রাজনৈতিক কাজ সবকিছুকেই স্বীকৃতি দেয়।

কিন্তু বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে এই নীতিমালাও তেমন জোরালোভাবে বিভিন্ন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হচ্ছে না।

বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে যথেষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। কিন্তু এতসব পদক্ষেপ নেয়ার পরও নারীর যথার্থ উন্নতি কতটুকু হয়েছে, এটাই বিচার্য। বাংলাদেশ সংবিধানের সমঅধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা নারী সমাজকে করেছিল অত্যন্ত উৎসাহিত ও আশাদৃপ্ত। কিন্তু দেখা যায় যে, এই অধিকারগুলো বেশিরভাগই কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ। সমঅধিকারের যথার্থ ব্যাখ্যা সংবিধানে দেয়া হয়নি। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর স্বার্থবিরোধী পূর্ব প্রচলিত আইনগুলো বাতিল অথবা সংস্কার ঘোষিত হয়নি। এছাড়া নারী সমাজের প্রতি সম্মান/মর্যাদা প্রদর্শনের মনোভাব অথবা রাষ্ট্রের একজন নাগরিক এবং সমাজের একজন মানুষ হিসেবে নারীকে অধিকার দেয়ার যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা আমাদের দেশে অনুপস্থিত থাকায় সংবিধানের এসব ধারা বাস্তবে অর্থহীন হয়েছে। ফলে নারীদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরনির্ভর হয়ে হাজারো দাসত্বের শৃংখলে শৃংখলায়িত হয়ে জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সাল থেকেই নারীদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বছর, ১৯৭৬ থেকে '৮৫ সাল পর্যন্ত দশ বছরকে নারী দশক ঘোষণা এবং নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ প্রণয়ন– সবকিছুই নারীর অধস্তন অবস্থাকে স্বীকার করে নারীর অবস্থান উন্নত করতে চেয়েছে। এছাড়া জাতিসংঘ ১৯৭৫, '৮০, '৮৫ এবং '৯৫ সালে– পরপর চারটি আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন করে। '৯৫ সালে বেইজিংয়ে যে আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয়, তাতে নারীদের অবস্থান উন্নত করার জন্য Platform for Action বা PFA গ্রহণ করা হয়। ২০০০ সালে PFA-ভিত্তিক কাজকর্মে কোন দেশে কি পরিমাণ অগ্রগতি হয়েছে তা মূল্যায়ন করার জন্য নিউইয়র্কে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ, নারী দশক, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন এবং বিশেষ করে PFA-এর উদ্যোগে বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হয়। কিন্তু তারপরও বলা যায়, নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ বা 'মিড'-তে বাংলাদেশের সম্মতি প্রদান ছিল সম্পূর্ণভাবে শর্তভিত্তিক। 'মিড'-এ ধারা ২, ১৩ক এবং ১৩(১)গ এবং ১৬ (১)চ ধারাতে বাংলাদেশ সম্মতি প্রদান করেনি। ১৯৯৭ সালে ১৩ক এবং ১৬ (১)চ-তে সম্মতি প্রদান করলেও এখনও ধারা নং ২-এবং ১৬(১)গ-তে সম্মতি প্রদান করা হয়নি। বাংলাদেশে নারী উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করার জন্য মহিলা ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে; কিন্তু এর কোন উল্লেখযোগ্য অবদান বাংলাদেশের নারী সমাজে এখনও প্রতিফলিত হয়নি। এ মন্ত্রণালয়টির প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল নারী ও পুরুষের বৈষম্য দূর করে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে, সরকার ঘোষিত কোটানীতি, সরকারি অফিসসমূহেই বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, উচ্চপদস্থ চাকরির চেয়ে নিম্নপদস্থ চাকরিতে প্রবেশাধিকার নারীরা বেশি পাচ্ছে। নারী উন্নয়নে, সরকার ঘোষিত নীতির সঙ্গে নীতিনির্ধারকদের মনমানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের ফলে দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রীয় বাজেটে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে নারীরা বঞ্চিত হচ্ছে।

সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে নারীরা সবচেয়ে বেশি। নারী পাচার, নারীকে যৌতুকের জন্য পীড়ন ও হত্যা, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ শুধু নারীকে নয়, গোটা সমাজের ওপর প্রেতাত্মার মতো ভর করে আছে। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থায় নারীরা সাক্ষরতার ক্ষেত্রে বেশকিছু উন্নতি করেছে। কিন্তু তারপরও আমাদের মনে রাখতে হবে, শিক্ষা এবং স্বাক্ষরতা এক নয়।

নারীবাদ ও নারী উন্নয়নের মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। নারীবাদ আন্দোলনের ধারাতেই সমাজ রাষ্ট্র/সরকার এবং জাতিসংঘ নারী উন্নয়নের নীতিমালা গ্রহণ করে। বাংলাদেশেও নারী উন্নয়নের সচেতনতা এসেছে, কিন্তু নারীর অবস্থানে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। কারণটি সূর্যালোকের মতোই স্পষ্ট– সমাজ এবং মানুষের মনমানসিকতার সঙ্গেই নারীর অবস্থান জড়িত। সমাজ এবং এর অধিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হলেই নারীর অবস্থা উন্নত হবে বাংলাদেশে।

ড. শওকত আরা হোসেন : *অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*